Handouts

মানব মানচিত্র

অধিকার, মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার

অধিকার :সম্পর্কের ভিত্তিতে ন্যায্য দাবী যার স্বীকৃতি মেলে তাই অধিকার।

মানবাধিকার:মানবাধিকার হচ্ছে মর্যাদার দাবী। অর্থাৎ, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকারই হচ্ছে মানবাধিকার। অপর কথায় যে অধিকার সহজাত, সার্বজনীন, অহস্তান্তরযোগ্য এবং অখণ্ডনীয় তাই মানবাধিকার।

মৌলিক অধিকার:যে অধিকারগুলো সংবিধানে স্বীকৃত এবং আদালতের মাধ্যমে কার্যকরযোগ্য তাই মৌলিক অধিকার। প্রকৃত অর্থে সব মৌলিক অধিকার মানবাধিকার কিন্তু সকল মানবাধিকার মৌলিক অধিকার নয়।

মানবাধিকার	মৌলিক অধিকার
• ব্যাপক ধারণা।	• মানবাধিকারের অংশ বিশেষ।
• মানুষের সহজাত অধিকার।	• সংবিধান স্বীকৃত অধিকার।
• সকল মানবাধিকারের বাস্তবায়ন আদালতের মাধ্যমে সম্ভব নয়।	• আদালতের মাধ্যমে বলবৎ যোগ্য।
• সার্বজনীন, ভৌগলিক সীমারেখা দ্বারা আবদ্ধ নয়।	• ভৌগলিক সীমারেখা দ্বারা আবদ্ধ।

মানবাধিকার:

মানবাধিকারহচ্ছে মর্যাদার দাবী। অর্থাৎ, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকারই হচ্ছে মানবাধিকার। অপর কথায় যে অধিকার সহজাত, সার্বজনীন, অহস্তান্তরযোগ্য এবং অখন্ডনীয় তাই মানবাধিকার।

১। সহজাত:

কেবল মানব শিশু হিসেবে জন্ম নেওয়ার কারণেই যে সকল অধিকার তার জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে, সে অধিকারগুলো কোনো কর্তৃপক্ষ দান অথবা খর্ব করতে পারে না অর্থাৎ এ অধিকারগুলো নিয়েই মানুষ জন্মায়।

২। সর্বজনীন:

মানবাধিকার নারী-পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ এবং ভৌগোলিক সীমারেখা নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

৩। অখন্ডনীয়:

মানবাধিকারের তিনটি মৌলিক উপাদান জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা কখনোই আলাদা আলাদা প্রদান করা যায় না। এগুলো সবসময় একত্রে প্রদান করতে হয়।

৪। আন্তঃনির্ভরশীল:

মানবাধিকারের তিনটি মৌলিক উপাদান জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা একে অপরের সাথে নির্ভরশীল। তাই, মানুষের সকল নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অধিকারগুলোকে একক এবং অবিভাজ্য হিসেবে গণ্য করতে হবে।

৫। অহস্তান্তরযোগ্য:

মানবাধিকারগুলোকে হস্তান্তর করা যায় না। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে মানবাধিকারের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, “সকল অধিকারই মানবাধিকার নয়”। যদিও সকল অধিকার মানুষের জন্য তৈরী হয়। মানবাধিকার হলো এমন সব অধিকার যা মানুষ সহজাতভাবে জন্মসূত্রে অর্জন করে। এগুলো কোন দেশ বা কালের সীমানায় আবদ্ধ নয়। এ অধিকারগুলো চিরন্তন ও সর্বজনীন। এগুলো অহস্তান্তরযোগ্য ও অখন্ডনীয়। কারণ এ অধিকারগুলো ছাড়া মানুষ মর্যাদাপূর্ণভাবে বেঁচে থাকতে পারে না।

এক নজরে ২৫টি অধিকার

জীবন, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার	দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকার	নির্যাতন ও অবমূল্যায়ন থেকে মুক্তির অধিকার	আইনের চোখে একজন ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার	আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান এবং আইনের আশ্রয় সমানভাবে পাওয়ার অধিকার
উপযুক্ত আদালত থেকে বিচার পাওয়ার অধিকার	বেআইনী আটক ও বন্দীদশা থেকে মুক্তি লাভের অধিকার	নিরপেক্ষ প্রকাশ্য শুনানীর অধিকার	অপরাধ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ ব্যক্তির মত আচরণ পাওয়ার অধিকার	পরিবার, বাড়ীতে এবং পত্র যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার
স্বাধীনভাবে নিজের দেশের যেকোনো স্থানে যাওয়া ও বসতি স্থাপন এবং অন্য দেশে যাওয়া ও ফিরে আসার অধিকার	অমানবিক যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্য দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়ার অধিকার	জাতীয়তা পাওয়া এবং পরিবর্তন করার অধিকার	বিয়ে করা এবং পরিবার গঠন করার অধিকার	সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার
নিজস্ব বিশ্বাস ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার	মতামত দেওয়া ও তথ্য পাওয়ার স্বাধীনতার অধিকার	শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ ও সংগঠন করার অধিকার	মুক্ত নির্বাচন ও সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার	সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার
কাঙ্খিত কাজ পাওয়া ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার	অবসর ও বিশ্রাম পাওয়ার অধিকার	পর্যাপ্ত জীবন-যাত্রার/ স্বয়ং সম্পূর্ণ মানের অধিকার	শিক্ষার অধিকার	সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে অংশগ্রহণের অধিকার

সমতা ও সাম্য :

সম্পদ বন্টনের একটি প্রক্রিয়া হলো **সাম্য,** যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন চাহিদার ভিত্তিতে তাদের সুযোগ সুবিধাকে বিবেচনা করা হয়। এর অর্থ হলো এই যে,পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে অধিক সুযোগ সুবিধা বা সম্পদ আহরনের পথ প্রশস্ত করতে হবে যাতে করে তাদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয় এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে/সর্বস্তরে তারা সমান অধিকার ভোগ করতে পারে। সমতার আকাঙ্খা পূরণের জন্য এই সাম্যভিত্তিক বিতরণ প্রক্রিয়া নারী এবং সুবিধা বঞ্চিত গোষ্ঠীর জন্য অত্যাবশ্যক। সাম্য সমতার পথ অর্জনকে প্রশস্ত করে।

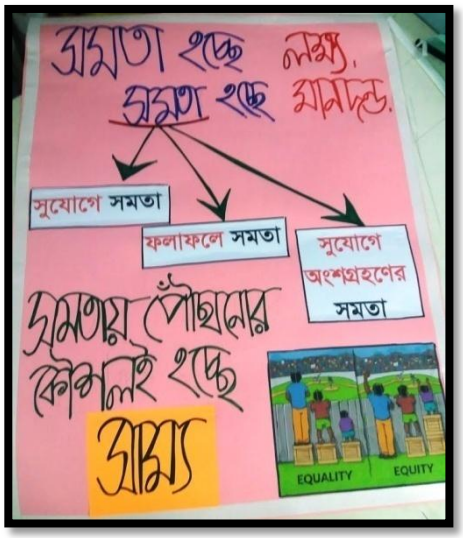

সমতা হচ্ছে একটি লক্ষ্য বা মানদন্ড এবং সাম্য হচ্ছে সেই লক্ষ্য অর্জনের একটি প্রক্রিয়া।

সমতার নীতি CEDAW Convention এর কেন্দ্রবিন্দু। তবে সমতা শব্দটি যদি শাব্দিক অর্থে কেবল ব্যবহার করা হয় তাহলে গতানুগতিকভাবে নারী কে পুরুষের সমান অধিকার পেতে হবে এই কথাটির বহিঃ প্রকাশ ঘটবে। এই ধারনার উৎপত্তিই হয়েছে এই সত্যতা থেকে যে সুযোগ সুবিধা, চাকুরী, পারিশ্রমিক, সম্পদ আহোরণ,স্বাস্থ্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী চরমভাবে অসম আচরণের শিকার হচ্ছে এবং এই জায়গা থেকে উত্তরণের রাস্তা হিসাবে দেখা হয় নারীকে পুরুষের মত অধিকার পেতে হবে। সমস্যা এই খানেই যে, যখন নারীর অধিকার চর্চা কে পরিমাপ করা হয় male standards থেকে। নারী পুরুষ রয়েছে ভিন্নতা বা পার্থক্য এবং তা কোন ভাবে বৈষম্যের কারণ হতে পারে না।

সমতা যদি প্রকৃত অর্থে অর্জন হয় তাহলে অবশ্যই সেখানে বিরাজ করবে:

- Equality of opportunity
- Equality of access to opportunity
- Equality of Results.

এখানে উল্লেখ্য যে, যখনই নারীর সম অধিকারের কথা উঠেছে তখনই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমতাকে দেখা হয়েছে।

AAA Framework

To monitor or involve the Govt officials in discharging of duties as an information officers of an institutions, the following **AAAQ Framework** can be followed .AAAQ stands for **Availability, Accessibility, Acceptability and Quality** and is a new, ground-breaking and hands-on approach to the so-called economic, social and cultural rights - such as the right to health, education, food and housing.

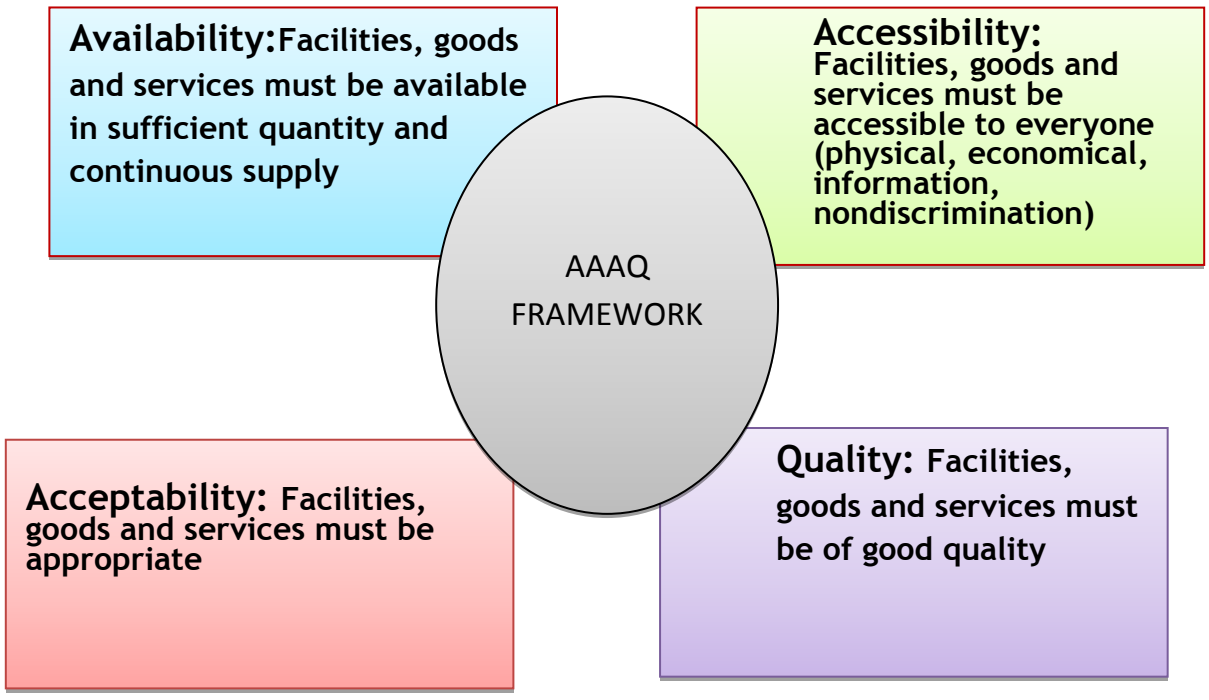

AVAILABILITY

(Need to have sufficient quantity of functioning facilities, goods and services, and programs.)

- Do you collect data disaggregated by different and multiple stratifies – such asinfant/adolescent/older persons, rural/urban, people with gender diversified groups, – on the availability of facilities, goods, services and programs for these populations. ?

- Are you looking at coverage gaps for populations that are not receiving a sufficient quantity of facilities, goods, services, and programs?

- Do you monitor the ratio of skilled service providers / workers to the populations needs?

ACCESSIBILITY

(Facilities, goods, and services have to be accessible (physically accessible, affordable, and accessible information) to everyone within the jurisdiction of the State party without discrimination.)

- Have you identified barriers to safe physical accessibility to facilities, goods, services, and programs for gender divers groups?

- Have you provided norms and standards that seek to overcome barriers to physical accessibility?

- Have you identified financial barriers to services for different gender divers groups?

- Do you monitor the extent to which -related information is made available at country/district level for different gender divers groups ?

- Do your technical documents provide accurate and understandable information about your related area for the groups?

ACCEPTABILITY

(The social and cultural distance between service systems and their users determine acceptability. All health facilities, goods, and services must be respectful and culturally appropriate, sensitive to gender and age. They also need to be designed to respectconfidentiality and improve the status of those concerned.)

- Do you ensure that facilities, goods, services and programs are people-centred and cater for the specific needs of different populations?

- Are UN programs acceptable to diverse groups?

- Do you assure that goods, facilities, services and programs are realized in accordance with international standards and ethics for:

  o confidentiality?
  o informed consent?

QUALITY

(Facilities, goods, and services must be scientifically approved and of good quality.)

- Have you established or ensured norms and standards of quality for:
- o services?
- o facilities?
- o professionals?
- o equipment?
- o determinants of rights ?

বৈষম্যঃ

মানবাধিকার এর স্বীকৃতি, ভোগ ও চর্চার ক্ষেত্রে যে পার্থক্য করা হয় বা বাঁধা দেওয়া হয় বা বাদ দেওয়া হয় যার ফলে মানুষ দূর্বল বা ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাকে বলে বৈষম্য।

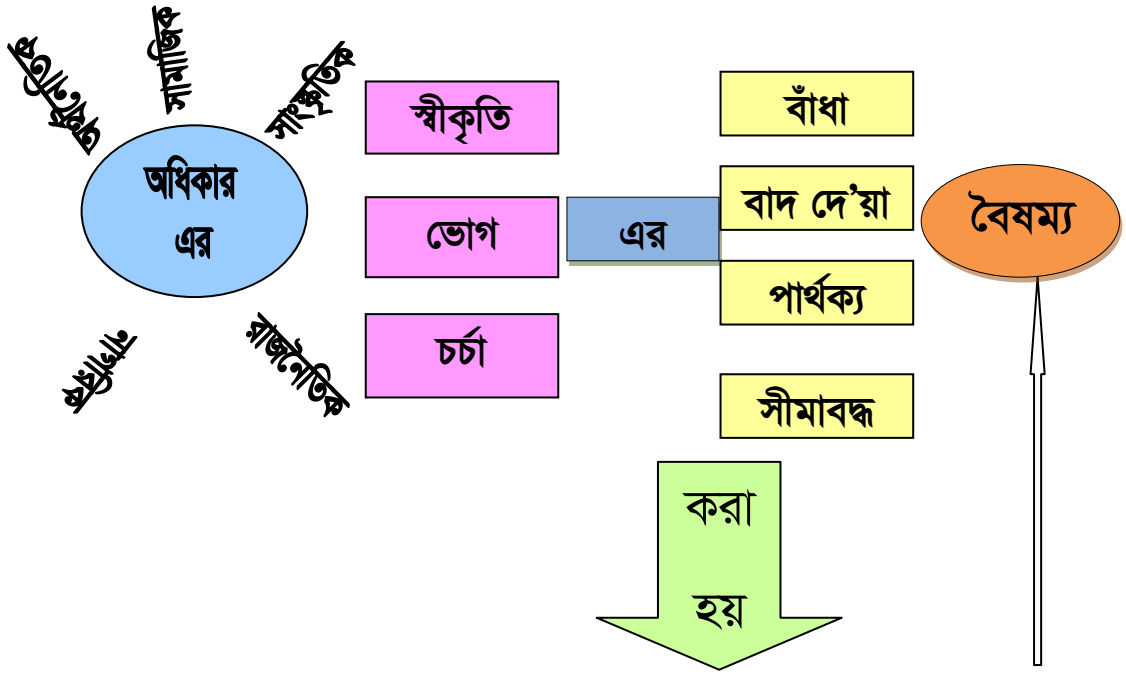

যার ফলে মানুষ দূর্বল বা ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাকে বলে বৈষম্য

জেন্ডার ও সেক্স :

জেন্ডার ঃ

জেন্ডার হচ্ছে সামাজিকভাবে গড়ে উঠা নারী-পুরুষের পরিচয়, সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী-পুরুষের মধ্যকার পার্থক্য, সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত নারী-পুরুষের ভূমিকা যা পরিবর্তনীয় এবং সমাজ সংস্কৃতিভেদে ভিন্ন। জেন্ডারকে তাই সামাজিক লিঙ্গ বলেও অভিহিত করা হয়।

যেমন- একজন নারীর জন্য সন্তান জন্মদান বা মা হওয়াই জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হিসেবে সমাজ নির্দিষ্ট করে দেয়, কিন্তু একজন পুরুষের বেলায় পিতা হওয়া নয় বরং একজন কর্মঠ ব্যক্তি হওয়াই সমাজের কাছে আকাঙ্খিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি একজন নারী বা পুরুষকে মানুষ করে তোলার পরিবর্তে ক্রমশ একজন নারী বা পুরুষ করে তোলে।

সেক্সঃ

লিঙ্গ বা সেক্স হচ্ছে প্রাকৃতিক বা জৈবিক কারণে সৃষ্ট নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্যসূচক ভিন্নতা, বা শারিরীক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের স্বাতন্ত্র, কিংবা নারী-পুরুষের শারিরীক বৈশিষ্ট্য। একে অনেক সময় জৈবিক লিঙ্গও বলা হয়।

এটা প্রকৃতিই সৃষ্টি করে থাকে, এর ভিত্তি প্রাকৃতিক। পরিবার, সমাজ, দেশ ভেদে এই বৈশিষ্ট্য সব জায়গাতেই একই রকম, যা পরিবর্তন করা যায় না। এই দৈহিক বা শারীরিক বৈশিষ্ট্য দিয়েই নারী পুরুষ চেনা যায়। শরীরের এই গঠনের জন্য পৃথিবীর সব জায়গায় ছেলে হচ্ছে ছেলে আর মেয়ে হচ্ছে মেয়ে।

জেন্ডার ও সেক্স এর পার্থক্য

সেক্স	জেন্ডার
প্রাকৃতিকভাবে তৈরি নারী এবং পুরুষের মাঝে জৈবিক, শারীরিক ভিন্ন বৈশিষ্ট্যকেই বলে সেক্স।	সমাজ কর্তৃক নির্ধারন নারী ও পুরুষের পোষাক, কাজ, আচরণ ইত্যাদির ভিন্নতাই হচ্ছে জেন্ডার।
সেক্স অপরিবর্তনীয় এবং সার্বজনীন। পরিবার, সমাজ, দেশ ভেদে একই রকম।	জেন্ডার পরিবর্তনশীল। সমাজ, দেশ এবং যুগ ভেদে এটি ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়।
এটি প্রকৃতির সৃষ্ট বলে একে প্রাকৃতিক লিঙ্গ বলা যায়।	এটি সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট বলে একে সামাজিক লিঙ্গ বলা যায়।
পৃথিবীর সব জায়গাতেই এটা একই রকম অর্থাৎ সর্বজনীন	সমাজ সংস্কৃতির ভিন্নতার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জেন্ডার ভূমিকার মধ্যেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

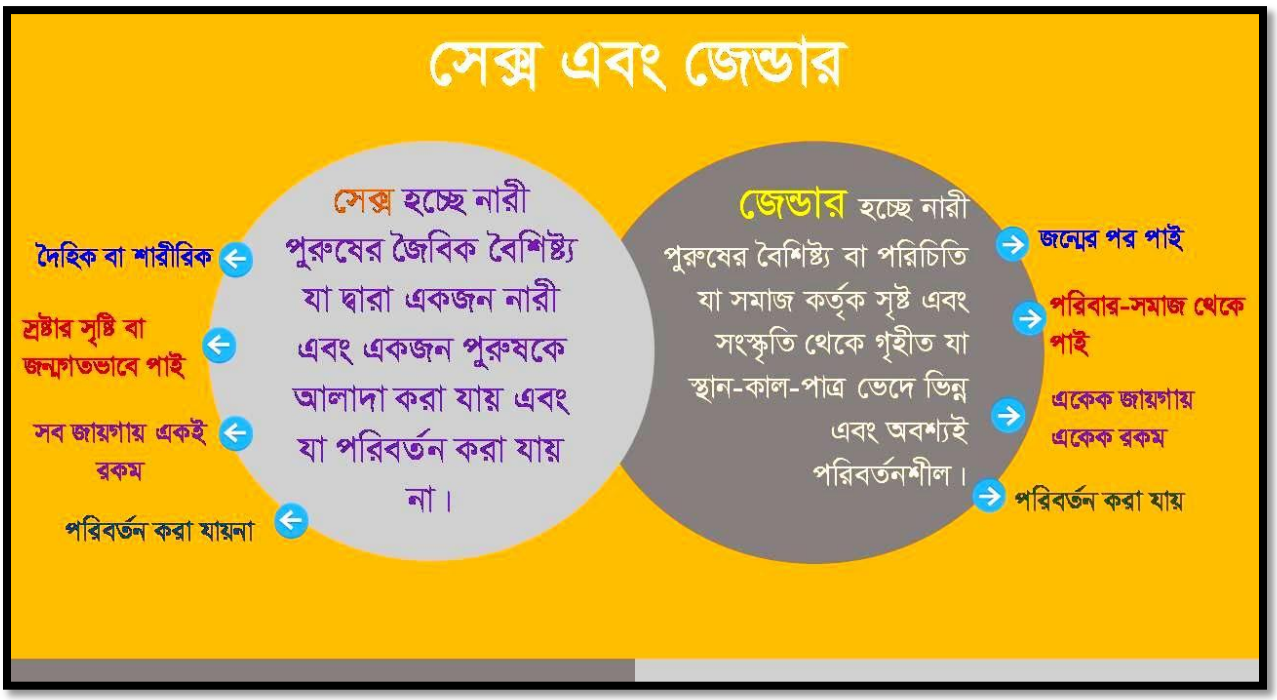

সামাজিকভাবেছাঁচে পরা ভূমিকা:

বৃটিশ শাসন অবসানের পরও এই উপমহাদেশের মেয়ে শিশু এবং নারী দ্বিতীয় শ্রেনীর মানুষ হিসেবে বিবেচিত। আমাদের সমাজে অধিকাংশ নারী ক্ষমতাহীন, মর্যাদাহীন ও সম্পদহীন অবস্থায় রয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের কারণে নারী প্রতিনিয়ত নানা নিপীড়ন, নির্যাতন ও সমস্যার শিকার হচ্ছে যা তার অবস্থাকে আরো নাজুক করে তুলেছে। নারীর প্রতি এই অন্যায় আচরণ ও বৈষম্য নারীদের শারীরিক বা মানসিক কারণে সৃষ্ট হয়নি। এর পেছনে রয়েছে সামাজিক-রাজনৈতিক কর্তৃত্ব তথা ক্ষমতার প্রভাব। সভ্যতার উষা লগ্ন থেকে শুরু করে ক্রম বিবর্তনের ধারায় সমাজে নারী পুরুষের মাঝে সামাজিক আচরণ ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। আদিম সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক ছিল সমতা ও সহযোগিতার। সামাজিক ভাবে পার্থক্যের ধারণা ছিল না। নারী পুরুষ উভয়ের কাজই ছিল সমান গুরুত্বের, সব কাজই বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য এই ধারণা ছিল মূখ্য। কিন্তু সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে প্রযুক্তি, জ্ঞান ও ক্ষমতার বিকাশে পিতৃতন্ত্রের ধারকেরা অর্থাৎ যারা নারীর ওপর সর্বময় ক্ষমতা চর্চা ও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চায় তারা নারী ও পুরুষের সম্পর্কটাকে নতুন রূপদান করে। ক্রমান্বয়ে নারীদের শ্রমশক্তি, সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা,যৌনতা, গতিশীলতা এবং সম্পত্তি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সম্পদের ওপর অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। শুধুমাত্র গৃহস্থালীর কাজে নারীকে সম্পৃক্ত করে তার ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রও সীমিত করে ফেলে এবং পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশ লাভ করে। এই মূল্যবোধ নারী ও পুরুষের মধ্যকার প্রাকৃতিক পার্থক্যকে বৈষম্যে রূপ দেয়। সমাজে নারীদের দমিয়ে রাখার জন্য প্রচলন করে কিছু ধারণা বা বিশ্বাস। নারীদের নিয়ে প্রচলিত এই বিশ্বাস যুগ যুগ ধরে সমাজে চর্চা হয়ে আসছে। নারী পুরুষ উভয়ই এগুলো বিশ্বাস এবং ধারণ করে চলেছে-

সমাজে নারীদের নিয়ে প্রচলিত বিশ্বাস

১) নারীর বুদ্ধি কম
২) সৃষ্টিকর্তা নারীদের পুরুষের অধীন করে পাঠিয়েছে
৩) নারী অসচেতন
৪) নারীর নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা নেই
৫) নারী দুর্বল এবং সঠিকভাবে কোন কাজ করতে অক্ষম
৬) প্রকৃতিগতভাবে নারী লাজুক, গৃহই হচ্ছে তার আসল পরিচয়
৭) নারীর প্রধান কাজ হচ্ছে সন্তান জন্মদান, লালন- পালন,রান্না ও গৃহস্থালীর কাজ করা
৮) নারী খুব আবেগপ্রবণ, তারা দৃঢ়ভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না
৯) নারীরা দায়িত্বশীল নয়
১০) নারী শুধু ভোগের জন্য, শারীরিক সৌন্দর্য্যই তাদের একমাত্র সম্পদ।
১১) নারী তার স্বামীর পরিচয়ে পরিচিত হবেন
১২) নারীদের সবসময় কম খাওয়া উচিত বিশেষ করে গর্ভবতী অবস্থায়
১৩) নারীদের বেশি লেখা পড়ার প্রয়োজন নেই, বেশি শিক্ষিত হলে স্বামীর কথা অমান্য করবে
১৪) পুরুষ ছাড়া নারী অসম্পূর্ন
১৫) নারী লোভী ও ছলনাময়ী
১৬) নারী হিংসুটে, স্বার্থপর ও সন্দেহপ্রবণ
১৭) নারী জটিল ও কঠিন বিষয় বুঝতে অক্ষম

১৮) নারী তরল পদার্থের মতো, যে পাত্রেই ঢালা হয় তারই আকার ধারণ করে

এই সমস্ত হাজারো বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি নারীদেরকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সমাজে প্রচলিত রয়েছে। কালে কালে এইসব বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি নানারূপ পরিগ্রহ করেছে। সাহিত্যে, গানে, শিল্পে ও কৌতুক, প্রবাদ-প্রবচনে নারীকে দেখানো হয়েছে পুরুষের চেয়ে দুর্বল, অবলা, অক্ষম এবং পুরুষের অধীন হিসেবে। এই ধারণা নারী পুরুষের মধ্যে অসমতা তৈরি করেছে। প্রকৃতি ছেলে ও মেয়ে শিশু সৃষ্টি করে, সমাজ কর্তৃক বৈষম্যের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষে পরিণত করে। এইখান থেকেই আসে জেন্ডার ও সেক্সের ধারণা।

প্রচলিত প্রবাদ

১. জাতের মেয়ে কালো ভাল
নদীর পানি ঘোলাও ভাল
সোনার আংটি বাঁকাও ভাল

২. যে নারী রেঁধে বেড়ে স্বামীর আগে খায়
জানিবে স্বামী মরিবে নিশ্চয়

৩. ঝুনা খাইলে গুণাহ নাই
পুরুষের অন্যায় ধরতে নাই

৪. পুরুষের রাগে বাদশা
নারীর রাগে বেশ্যা

৫. নারী হলো দেবী
সহ্য করে সবই

৬. ভাই বড় ধন রক্তের বাঁধন
যদিও পৃথক হয় নারীর কারণ

৭. গাই গুণে দুধ
বাপ গুণে পুত

৮. মেয়ে পরের বাড়ীর ধন
জানে সর্বজন

৯. নারীর পছন্দ তিন
ঝাল, টক ও কড়া স্বামী

১০. সতী নারীর পতি মরে না

১১. ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সকল
শিশুর অন্তরে

১২. ভাত খাইছি, মাছ খাইছি আরো খাইছি খাসি
সঙ্গে করে নিয়ে আসছি খেদমতের দাসী

১৩. পায়ের উপর পা তুলে যে বা নারী বসে
ছয় বছর পর তার সিঁধির সিদুর খসে

১৪. পুরুষের বসায় সভা ভালো
নারীর বসায় এলোমেলো

১৫. তিন নারী একত্রে হলে ফেরেস্ড়া ঘরে থাকেনা

১৬. হাসিলে গন্ডস্থলে টোল পড়ে যার
বন্ধ্যা রবে সে নারী দুনিয়ার মাঝার

১৭. ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো

১৮. লেপা পৌছাতে বাড়ী
তেলে সিঁদুরে নারী

১৯. অভাগার গরু মরে
ভাগ্যবানের বউ মরে

২০. ভাই মরে গেলে ভাই পাবো না
বৌ মরলে বৌ পাবো

২১. বাপের বাড়ি এই গায়, শশুর বাড়ী ঐ গায়
তোমার বাড়ী কইগো নারী, তোমার বাড়ি কই

২২. নারী হচ্ছে শয়তানের গাড়ী

২৩. যেমন মা তেমন ঝি,
তেমন তান নাতিপুতি

২৪. বাপ কা বেটা
সিপাইকা ঘোড়া

২৫. কথায় কথা বাড়ে
জলে বাড়ে ধান
বাপের বাড়ি থাকলে কন্যা বাড়ে অপমান

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা :

ভূমিকা

শত শত বছরের পুরানো একটি সামাজিক সমস্যা জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা নিয়ে আলোচনা হলে আমরা আমাদের চারপাশে যেসব ঘটনা দেখি তা হল বিভিন্ন বয়সের নারীর বিরুদ্ধে হয়রানি, যৌন নির্যাতন, স্ত্রী নির্যাতন ইত্যাদি। ঘরে বাইরে বয়স, শ্রেণি নির্বিশেষে শুধুমাত্র দৈহিক ভিন্নতার কারণে ও পুরুষের সাথে বিশেষ সম্পর্কের কারণে নারী সহিংসতার শিকার হয়। এ অবস্থার পরিবর্তন হতেই হবে।

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা বলতে বুঝি-

মেয়েশিশু সহ বিভিন্ন বয়সের নারী ও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের বিরুদ্ধে সংঘটিত আচার আচরণ যা ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ করে, পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসন, আইনগত বিধান দ্বারা আরোপিত ব্যবস্থায় সর্বক্ষেত্রে শুধুমাত্র নারী বা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ হিসেবে জন্ম গ্রহণ করার কারণে যেভাবে অর্থনেতিক,সামাজিক,শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, আক্রমণ, হুমকি ও আঘাতের শিকার হয়।

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ পুলিশ সদর দপ্তর এর সূত্র অনুযায়ী, ২০০১-২০১৪ পর্যন্ত নারীর উপর সহিংসতার মামলা হয়েছে মোট ২,০৩,২০০ টি। শুধুমাত্র ২০১৪ সালে ১৫,৬১৮টি সহিংসতার মামলা হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায়, স্বামী ও তার পরিবারের নিকটজনদের দ্বারা ঘরে ঘরে সংঘটিত হয় অসংখ্য নির্যাতনের ঘটনা যা নিয়ে সাধারণত কোন মামলা হয় না। জোরপূর্বক ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর উপায়ে গর্ভপাতের কারণে বহু নারীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর পিছনেও রয়েছে নির্যাতন ও নিপীড়নের অসংখ্য জানা-অজানা ঘটনা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সূত্রমতে, এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভপাতের কারণে সারা বিশ্বে প্রতি বছর ২ কোটি ১৬ লক্ষ নারী প্রাণ হারায়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র **"নারীর প্রতি সহিংসতা জরীপ ২০১৫"** অনুযায়ী, শতকরা ৭৩ ভাগ নারী নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হন। **২০১৫ জরিপ অনুযায়ী** শতকরা **২৪.৮ নারী যৌন নির্যাতনের শিকার হন।** তাদের অনেকে বলেছেন স্বামী কর্তৃক যৌন নির্যাতনের কথা। অথচ বাংলাদেশের ফৌজদারী আইনে বৈবাহিক সম্পর্কে মধ্যে যৌন নির্যাতন ও সহিংসতা অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় না।

নারীর উপর নির্যাতন, সহিংসতা, অপমান, অবহেলা নতুন কোন বিষয় নয়। যুগ যুগ ধরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবনের কখনো না কখনো প্রায় প্রতিটি নারীকেই এই অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়; যার অন্তর্নিহিত কারণ পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর অধস্তন অবস্থান, নারীকে মানুষ হিসাবে গণ্য না করার মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি নারীকে ভোগ্য বস্তু ভাবা। এর সাথে যুক্ত হয়েছে দেশে বিরাজমান গণতন্ত্রহীনতা, দলীয় রাজনীতির আগ্রাসন ও ক্ষমতার নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা; যার ফলশ্রুতি বিচারহীনতা, প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ও অনিয়ম। এহেন অবস্থা নারীর উপর নির্যাতন এবং সহিংসতার মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। আমাদের সংস্কৃতিতে নারীকে

বিভিন্নভাবে হেয় করা হয়, নারীর চরিত্রের উপর আক্রমণকে অন্যায় বা অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না, নারীর শরীর ও যৌনতার উপর আঘাতের প্রতিবাদ করার পরিবর্তে নারীকে দোষারোপ ও নিন্দার প্রবণতাই বেশি।

সহিংসতা ও নির্যাতনের ধরণ :

সাধারণত আমাদের চারপাশে যে সব সহিংসতা ও নির্যাতন ঘটে সেগুলোকে **পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ অনুযায়ী চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যা নিম্নে বর্ণিত হল:**

১. শারীরিক নির্যাতন :

এমন কোন কাজ বা আচরণ করা, যার দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির **(নারী ও শিশুর)** জীবন, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা শরীরের কোন অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকে এবং সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে অপরাধমূলক কাজ করতে বাধ্য করা বা প্ররোচনা প্রদান করা বা বলপ্রয়োগও ইহার অর্ন্তভুক্ত হবে

যেমন:

- মারধর ,আঘাত ও যে কোন শারীরিক নির্যাতন
- এসিড আক্রমণ
- পাচার
- অপহরণ
- হত্যা
- আত্মহত্যায় প্ররোচনা বা বাধ্য করা
- ধাক্কা দেয়া
- গলা চিপে ধরা
- চুলের মুঠি ধরে টানা
- চড়, থাপ্পর ইত্যাদি

২. মানসিক নির্যাতন :

নিম্নবর্ণিত বিষয়সমুহ অর্ন্তভুক্ত হইবে

ক) মৌখিক নির্যাতন, অপমান, অবজ্ঞা, ভীতি প্রদর্শন বা এমন কোন উক্তি করা, যাহা দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির মানসিকভাবে ক্ষতি হয়

খ) হয়রানি, অথবা

গ) ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ অর্থাৎ স্বাভাবিক চলাচল, যোগাযোগ বা ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা মতামত প্রকাশের উপর হস্তক্ষেপ

যেমন:

- কোথাও যেতে বাধা দেয়া
- গালমন্দ করা
- অপমান করা

- হেয় করে কথা বলা
- বিরক্ত করা
- সন্দেহ করা
- বিভিন্ন ধরনের বাধ্যবাধকতা অরোপ করা
- মানসিক অশান্তি বা অস্থিরতা করা ইত্যাদি

৩. যৌন নির্যাতন:

যৌন প্রকৃতির এমন আচরণও অর্ন্তভুক্ত হবে, যা দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সম্ভ্রম, সম্মান ও সুনামের ক্ষতি হয় ।যৌন আকাঙ্খা ও চাহিদা পূরণে বিশেষ ধরণের নির্যাতন যা নারীর শরীর ও আত্মার উপর সংঘটিত একটি জঘন্যতম অপরাধ।

যেমন

- ধর্ষণ
- ধর্ষণের চেষ্টা
- দলবদ্ধ ধর্ষণ
- প্রতারণামূলক বিয়ে বা যৌন সম্পর্ক স্থাপন
- জোরপূর্বক যৌন ব্যবসায় বাধ্য করা ইত্যাদি

৪. আর্থিক ক্ষতি :

"আর্থিক ক্ষতি" অর্থে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহও অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা-

(অ) আইন বা প্রথা অনুসারে বা কোন আদালত বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যে সকল আর্থিক সুযোগ-সুবিধা, সম্পদ বা সম্পত্তি লাভের অধিকারী উহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা অথবা উহার উপর তাহার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান;

(আ) সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র প্রদান না করা;

(ই) বিবাহের সময় প্রাপ্ত উপহার বা স্ত্রীধন বা অন্য কোন দান বা উপহার হিসাবে প্রাপ্ত কোন সম্পদ হইতে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা বা উহার উপর তাহার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান;

(ঈ) সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির মালিকানাধীন যে কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে হস্তান্তর করা বা উহার উপর তাহার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান; অথবা

(এ) পারিবারিক সম্পর্কের কারণে যে কোন সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধা দিতে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির ব্যবহার বা ভোগদখলের অধিকার রহিয়াছে উহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা বা উহার উপর তাহার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান।

যেমন

- যৌতুক দাবী করা
- গয়না, সম্পত্তি নিয়ে নেয়া
- বেতন নিয়ে নেয়া ইত্যাদি

৫.যৌন হয়রানি

মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ যৌন নির্যাতন বিষয়ে বিগত ১৪ মে, ২০০৯ইং তারিখে রীট পিটিশন নং ৫৯১৬/২০০৮- এর প্রেক্ষিতে এক যুগান্তকারী নির্দেশনা প্রদান করেছে। যার মাধ্যমে যৌন নির্যাতন ও হয়রানির সংজ্ঞার ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।

যৌন হয়রানি বলতে বুঝায়-

ক) অনাকাঙ্খিত যৌন আবেদনমূলক আচরণ (সরাসরি কিংবা ইঙ্গিতে) যেমনঃ শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরনের প্রচেষ্টা;

খ) প্রশাসনিক, কর্তৃপক্ষীয় এবং পেশাগত ক্ষমতা অপব্যবহার করে কারো সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা;

গ) যৌন হয়রানি বা নিপীড়নমূলক উক্তি;

ঘ) যৌন সুযোগ লাভের জন্য অনাকাঙ্খিত দাবি বা আবেদন;

ঙ) অনাকাঙ্খিত পর্ণোগ্রাফী দেখানো;

চ) যৌন আবেদনমূলক অনাকাঙ্খিত মন্তব্য বা ভঙ্গী;

ছ) অশালীন ভঙ্গি, যৌন নির্যাতনমূলক ভাষা বা মন্তব্যের মাধ্যমে উত্যক্ত করা, কাউকে অনুসরণ করা, যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করে ঠাট্টা বা উপহাস করা;

জ) চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, ছবি, নোটিশ, কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল, নোটিশ বোর্ড, অফিস, ফ্যাক্টরী, শ্রেণিকক্ষ, বাথরুমের দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক অপমানজনক কিছু লেখা;

ঝ) ব্লাকমেইলিং অথবা চরিত্র লঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে স্থির চিত্র এবং ভিডিও ধারণ করা;

ঞ) যৌন নিপীড়ন বা হয়রানির উদ্দেশ্যে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা;

ট) প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হুমকী দেয়া বা চাপ প্রয়োগ করা;

ঠ) ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বা প্রতারণা/ছলনার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে চেষ্টা করা।

শাস্তি

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করবে এবং প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা বিধি অনুসারে ৩০ কার্য দিবসের মধ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, এবং/অথবা

যদি উক্ত অভিযোগ দন্ডবিধি অথবা প্রচলিত অন্যান্য আইন অনুযায়ী অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় তাহলে যথাযথ আদালত বা ট্রাইবুনালে পাঠিয়ে দেবে।

৬. অন্যান্য ধরণের সহিংসতা :

- তালাক
- বহুবিবাহ
- স্ত্রী সন্তান পরিত্যাগ
- ভরণপোষণ না দেয়া
- ফতোয়া বা ধর্মকে ব্যবহার করে নারীকে শারীরিক মানসিক শাস্তি
- ছেলের তূলনায় মেয়েকে কম গুরুত্ব দেয়া
- প্রতারণা করা ইত্যাদি

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন উদ্যোগ :

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে আইন: বহুমাত্রিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা রোধ ও প্রতিকার সম্ভব, এর মধ্যে আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এবিষয়ে মূল আইন হল বাংলাদেশ দন্ডবিধি, ১৮৬০। গত কয়েক বছরে বেশকিছু আইন সংশোধন করা হয়েছে ও কিছু বিশেষ আইন ও পাশ করা হয়েছে। সাধারণত যে আইন জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ঘটনায় বিচারের জন্য প্রয়োগ করা হয় সেগুলো হল:

- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধন ২০০৩)
- এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২
- এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২
- আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০, (সংশোধন ২০০৬)
- বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭
- যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০
- মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১
- মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২
- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০
- পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫
- শিশু আইন ২০১৩

উপরিউল্লিখিত আইনসহ অন্যান্য যেকোন আইন সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এই লিংক (**http://bdlaws.minlaw.gov.bd/**)থেকে সহজে পাওয়া যাবে।

সরকারী প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ:

- বহুমূখী কার্যক্রম - নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ (নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে বহুমুখী কার্যক্রম - Multi Sectoral Program on Violence Against Women)
- ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি)

বর্তমানে ৭ টি বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ ও ফরিদপুরে ১ টি সহ মোট ৮ টি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি),৪০ টি জেলা ও ২০ টি উপজেলায় মোট ৬০ টি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল (ওসিসি) চালু করা হয়েছে। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ১২ টি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে এই ওসিসি গুলো একযোগে কাজ করছে। একই সাথে সমন্বিত সকল সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটে ওসিসি হাসপাতালের জরুরী বিভাগ সংলগ্ন হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

- আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গ

– পুলিশ, ডাক্তার, আইনজীবি ও বিচারক

- হাসপাতাল, ডাক্তার ও রাসায়নিক পরীক্ষক: আঘাত, ধর্ষণ, মৃত্যু, এসিড আক্রমণ এধরণের ঘটনার ক্ষেত্রে যা প্রয়োজন হয়
    - আঘাতের শিকার হলে:কোন জায়গায়, কতদিন আগে. ক্ষতর পরিমান এবং কি অস্ত্র দিয়ে ক্ষত করা হয়েছে তার প্রতিবেদন
    - ধর্ষণে শিকার হলে: শারীরিক আঘাত, কামড় এর চিহ্ন ফরেনসিক পরীক্ষা ও রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে ধর্ষণের আলামত চিহ্নিত করা
    - এসিড দ্বারা আক্রান্ত হলে: রাসায়নিক ও মেডিকেল পরীক্ষার মাধ্যমে কি ধরনের দাহ্য পদার্থ, কি ধরণের ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে ইত্যাদির প্রতিবেদন
    - জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ঘটনায় মামলা প্রমাণের জন্য ডাক্তারী পরীক্ষা, ডাক্তারের সার্টিফিকেট, রাসায়নিক পরীক্ষকের সার্টিফিকেট এবং ডাক্তার ও পরীক্ষকের সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ।
- কাউন্সেলিং সহায়তা

– ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার এর মাধ্যমে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে

- নিরাপদ হেফাজতে থাকা বা সুরক্ষা
- আশ্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে পুন:র্বাসন
- আইন সহায়তা কমিটি (জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে)
- বিভিন্ন হটলাইন এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হটলাইন:
    - মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের হেল্পলাইন ১০৯ - নারী ও শিশু নির্যাতনের বিষয়ে পরামর্শ
    - স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়ের হেল্প লাইন ১৬২৬৩- স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোন পরামর্শ
    - এসিড সারভাইভার ফাউন্ডেশনের হেল্প লাইন ০১৭১৩-০১০৪৬১- এসিড আক্রমণের শিকার হলে সহায়তা
    - জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা - ১৬৪৩০- যে কোন আইনী সহায়তা পেতে
    - জরুরী পুলিশ সহায়তা ৯৯৯

বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগ:

নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি হাসপাতাল, পুলিশ, এনজিও বা অন্য যার কাছেই যাক না কেন তারা সবাই ওসিসির সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় সেবা দিতে পারেন।

একজন নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি যে সকল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেবা নিতে পারেন-

নির্যাতনের ঘটনার অভিযোগকারী আদালত, থানা বা হাসপাতাল যে কোন জায়গায় বিচারের জন্য প্রথম যেতে পারেন।

- থানায় মামলা দায়ের - আঘাত ও ধর্ষণের আলামত এর জন্য ডাক্তারি পরীক্ষা ও সনদপত্র প্রয়োজন। কারণ ডাক্তারি পরীক্ষার প্রতিবেদন পুলিশ তদন্ত কার্যক্রমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সাধারনত পুলিশ নিজ উদ্যোগে ডাক্তারী পরীক্ষা করায় এবং ডাক্তারি পরীক্ষার সনদের ফটোকপি নির্যাতনের শিকার নারী পাবে। জখম লঘু বা অল্পমাত্রায় হলে নির্যাতনের শিকার নারী নিজে ডাক্তারি পরীক্ষা করতে পারেন ও সনদ সংগ্রহ করতে পারে।
- থানা এজহারভুক্ত করে সংশ্লিষ্ট আদালতের কাছে প্রতিবেদন পাঠাবে। প্রয়োজনীয় আলামত উদ্ধার ও স্বাক্ষীর জবানবন্দি নিয়ে তদন্ত কাজ পরিচালনা করবে । আসামী গ্রেফতারের ব্যবস্থা করা ও তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি করে আদালতে প্রেরণ করবে। আদালতের তত্ত্বাবধানে মামলার তদন্ত কাজ পরিচালিত হয়। অভিযুক্ত ও স্বাক্ষীকে আদালতের নির্দেশে (সমন ও ওয়ারেন্ট পাবার পর) আদালতে উপস্থিত করবে।

- প্রভাবশালী ব্যক্তির বা অন্য যেকোন কারনে নির্যাতনের শিকার কোন ব্যক্তি থানায় অভিযোগ করতে ব্যর্থ হলে সেক্ষেত্রে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল সরাসরি অভিযোগ গ্রহণ করবেন। আদালতে সরাসরি বিচার প্রার্থনা করা হলে বিচারক অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে এবং সাধারনত ঘটনা তদন্ত করার জন্য থানায় পাঠান ও তদন্তের নির্দেশ দেন। গৌন বা লঘু অপরাধ যেমন স্ত্রীকে মারধর করা ,খোরপোষ না দেয়া বা বহুবিবাহ ইত্যাদি ঘটনায় স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিকে তদন্তের দায়িত্ব দিয়ে থাকেন। আদালতের তত্ত্বাবধানে মামলার তদন্ত কাজ পরিচালিত হয়। সমন বা ওয়ারেন্ট কার্যকর করতে কোন পুলিশ কর্মকর্তা দায়িত্বে অবহেলা করলে আদালত তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারেন।

- আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে মামলার যে কোন পক্ষ আপীল বিভাগে আবেদন করার সুযোগ আছে।
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩) এবং ফৌজদারী আইনের আওতায় পড়ে এমন অপরাধসমূহে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য সরকারি আইনজীবী রয়েছেন। তিনি পাবলিক প্রসিকিউটর (পি ,পি) নামে পরিচিত। এই সকল মামলায় নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির পক্ষে নিজ অর্থে আইনজীবী নিয়োগ দেয়ার প্রয়োজন নাই।

- আইন সহায়তা কমিটি : আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল, সহায় সম্বলহীন এবং বিভিন্ন আর্থ- সামাজিক কারণে যারা বিচার পায় না তাদেরকে আইনগত সহায়তা দেয়ার নিমেত্তে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ (সংশোধন ২০০৬) অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় আইন সহায়তা সংস্থা আছে। এই সংস্থার প্রধান হলেন জেলা ও দায়রা জজ। এই সংস্থার মাধ্যমে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় মামলার ক্ষেত্রেই আইনী সহায়তা পাওয়া যায়। কমিটি বরাবর আবেদনের প্রেক্ষিতে আইনজীবী, কোর্ট ফি ছাড়াও অন্যান্য খরচাদি যেমন মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট কাগজ ও দলিলপত্রের কপি বিনামুল্যে পাওয়া যায়।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়েসরকারি বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ:

- জেলা সদর হাসপাতাল
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক নিরাপদ আবাসন
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল
- পারিবারিক আদালত
- ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল (ওসিসি)
- গ্রাম্য সালিশী
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর- মহিলা বিয়ষক কর্মকর্তা
- মানবাধিকার কমিশন

সর্বোপরি একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আমাদের সকলের করণীয়

- হাইকোর্টের নির্দেশনা বাস্তবায়নে নিজ নিজ এলাকায় সরকারের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা
- জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, পারিবারিক বিরোধ নিরসন, নারী ও শিশু কল্যাণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটিসমূহের কার্যক্রমকে পর্যবেক্ষণ; সহিংসতার তথ্য সংগ্রহ ও সংশ্লিষ্টদের কাছে তা সরবরাহ করা
- নিজ নিজ এলাকায় নারী নির্যাতনের ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে এ বিষয়ে স্থানীয় প্রচার মাধ্যমে তথ্য প্রেরণ করা

পিতৃতন্ত্র ও এর উৎস

পিতৃতন্ত্র শব্দটির অর্থই হলো পিতা বা গোষ্ঠী প্রধানের শাসন ব্যবস্থা। পিতৃতন্ত্র বলতে এখানে এমন একটি সমাজব্যবস্থাকে বোঝাচ্ছে যেখানে পুরুষই পরিবারের সকল সদস্যের সম্পর্ক, সম্পত্তি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সকল বিষয়ে পিতা বা গোষ্ঠী প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। এই সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাস করা হয় যে পুরুষগণ নারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, নারীদের উপর পরুষের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং নারীরা পুরুষের সম্পত্তি। সুতরাং পিতৃতন্ত্র হচ্ছে সামাজিক কাঠামো আর রীতিনীতির এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে পুরুষ নারীকে নিয়ন্ত্রণ, নিপীড়ন এবং শোষণ করে। নারীকে উপেক্ষা, অপমান, দৈহিক পীড়ন ইত্যাদির মাধ্যমে পিতৃতন্ত্রের লক্ষ্য প্রকাশ ঘটে। মূলতঃ পিতৃতন্ত্রের মূলে কাজ করে বৈষম্য। আর এই বৈষম্য ক্রমাগতভাবে নারীকে সর্বক্ষেত্রে হেয় করে।

সিলভিয়া ওয়াল বি বলেছেন পিতৃতন্ত্র 'সামাজিক কাঠামো আর রীতিনীতির এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে পুরুষ নারীকে নিয়ন্ত্রণ, নিপীড়ন এবং শোষন করে'।

তাই বলা যায়, পিতৃতন্ত্র এমন একটি ব্যবস্থা যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে এমন একটি মতাদর্শ যা পুরুষকে নারীর তুলনায় বেশী দক্ষ এবং শক্তিশালী বলে মনে করে, নারীর উপর পুরুষের আধিপত্যকে অনুমোদন করে এবং নারীকে পুরুষের সম্পত্তি বলে গণ্য করে।

সাধারণভাবে পিতৃতান্ত্রিক চিন্তাভাবনায় পুরুষের কর্তৃত্ব প্রচলিত থাকলেও, নারীরা অনেক সময় এই ভাবনাগুলোর ধারক-বাহক। যেমন- কোন কোন সময় নারীরা ক্ষমতার অধিকারী হয়ে কিছু সুবিধা আদায় করে নিয়েছে এবং দুর্বলদের অধঃস্তন করে রেখেছে পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবের বশবর্তী হয়ে। তাই পিতৃতন্ত্রকে একটি "সামাজিক ব্যবস্থা" হিসাবে দেখাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এভাবে দেখলে পিতৃতন্ত্র **পুরুষদের বিপক্ষে বা পুরুষ মাত্রই আধিপত্যবাদী আর নারী মাত্রই বশ্যতার অধীন** এই ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করা যায়।

এই পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবে সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটি হিসাবে পরিবারকে সনাক্ত করা যেতে পারে। এই পরিবারেই একটি শিশু বেড়ে ওঠার সাথে সাথে পিতৃতান্ত্রিক আদর্শকে ধারণ করে। ছেলেরা নিজেদের মূল্যবান ভাবতে শেখে আর হয়ে ওঠে কঠোর, আত্মবিশ্বাসী, উপার্জনকারী, নির্যাতনকারী, সিদ্ধান্ত প্রদানকারী। আর প্রচলিত সামাজিক ধারণা অনুযায়ী মেয়েরা হয়ে ওঠে কোমল, শান্ত, ধীরস্থিত, লাজুক, গৃহস্থালী কাজে পারদর্শী, পরনির্ভলশীল। এই ভাবে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষ সম্পর্ক হয়ে যায় বৈষম্যমূলক এবং একই সাথে অসম। আর এই অসম সম্পর্ক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইনগত প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট যা পুনঃ পুনঃ চর্চায় হয়ে ওঠে স্বাভাবিক । আসলে

পিতৃতন্ত্র এমন একটি Mindsetতৈরী করে যা নারী-পুরুষের অসম সম্পর্ককে/অস্বাভাবিক জিনিষকে স্বাভাবিক মনে করতে শেখায়।

পুরুষতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ এলাকা:

পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণতঃ পুরুষ নারী জীবনের নিম্নলিখিত এলাকাগুলি/ক্ষেত্রগুলি নিয়ন্ত্রণ করেঃ

১। মেয়েদের উৎপাদনমূলক ক্ষমতা বা শ্রমশক্তি

বাড়ীতে মহিলারা আজীবন বিনা পারিশ্রমিকে স্বামী, সন্তানদের ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নানাভাবে সেবাদান করে যান। মহিলারা তার এই শ্রমের কোনো মূল্য দূরে থাক, কোন স্বীকৃতিই পান না। ঘরের বাইরের কাজের ক্ষেত্রে নারী কখনও স্বাধীনতা ভোগ করে না। হয় তাকে শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য করা হয় নয়তো তাকে কাজ করার অনুমতিই দেওয়া হয় না। নারীর শ্রম থেকে যে আয় হয় তা হয়ে যায় পুরুষের সম্পত্তি আবার কোথাও কোথাও নারীদের শুধুমাত্র কম মুল্যের বা নিম্নমানের কাজে নিযুক্ত হতে বলা হয়। নারীর শ্রমের উপর এই নিয়ন্ত্রণের মূলে রয়েছে পুরুষের বৈষয়িক লাভ।

২। নারীর সন্তান উৎপাদনঃ

পুরুষ নারীর জন্মদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। অনেক সমাজেই নারী ক'টি সন্তান নেবে, কখন সন্তান নেবে, জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো অধিকারই থাকে না, সব সিদ্ধান্ত পুরুষেই নেয়।

৩। নারীর যৌনতার উপর নিয়ন্ত্রণঃ

নারীকে পুরুষের ইচ্ছা ও চাহিদা অনুযায়ী যৌন তৃপ্তি দিতে বাধ্য করা হয়। বিবাহ বর্হিভূত কোনো সম্পর্ককে নারীর যৌনতার অন্য কোন প্রকাশকে প্রত্যেক সমাজই নৈতিক ও বৈধতার কারণে কঠোর চোখে দেখে। অথচ সমাজ পুরুষের ব্যভিচারের প্রতি অন্ধ থেকে যায়। শুধু তাই নয় কখনও কখনও নারীর যৌনতাকে পুরুষ বিক্রি করে লাভবান হয়। তাকে বেশ্যাবৃত্তিতে ঠেলে দেয়।

৪। নারীর গতিশীলতাঃ

নারীর যৌনতা, সৃষ্টিশীলতা, কর্মক্ষমতা ও সন্তান জন্মদান ক্ষমতার উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে পুরুষ নারীর উপর নানা নিষেধাজ্ঞা ও কড়াকড়ি আরোপ করে। যেমন, পর্দা, ঘরের বাইরে যাওয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা পুরুষের সাথে সম্পর্ক ও সংযোগ স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করা ইত্যাদি। এভাবে নারীর স্বাধীনতা ও গতিশীলতা খর্ব করা হয়। পুরুষ এক্ষেত্রে একেবারেই স্বাধীন। তার উপর এই নিয়ন্ত্রণের কোনো একটিও আরোপ করা হয় না।

৫।সম্পত্তি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সম্পদঃ

বেশীরভাগ সম্পত্তি ও অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ পুরুষের আয়ত্বে থাকে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে এক পুরুষের হাত থেকে অন্য পুরুষের হাতে সাধারণত পিতা থেকে পুত্রের হাতে তার মালিকানা বর্তায়।

যদিও নারীর উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু (পুরুষের তুলনায় অল্প) পাওয়ার থাকে, তবুও তা নানাভাবে আবেগ, সামাজিক চাপ, কখনও বা জোর করে তাকে সেই সম্পত্তির ভোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়।

পিতৃতান্ত্রিকতার বেড়াজাল এবং নারী-পুরুষ সম্পর্ক

সাম্প্রতিককালে জেন্ডার সমতা অর্জন অন্যতম উন্নয়ন এজেন্ডা হয়ে উঠেছে। জেন্ডার বৈষম্যের অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিকতার মাশুল শুধু নারীকেই দিতে হয় না, পুরুষ এবং সাধারণভাবে সমাজকেও এর জন্য মূল্য দিতে হয়।

আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে ছেলে সন্তানের প্রতি পক্ষপাত ও মেয়ে সন্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে দেখা যায়। সম্ভবত পর্যাপ্ত খাবার ও যত্নের অভাবে এদেশে ৫ বছরের কম বয়সের মেয়ে শিশুর মৃত্যু হার একই বয়সের ছেলে শিশুর চাইতে ৩৫% থেকে ৫০% বেশী। ছেলে সন্তানের জন্ম দিলে পরিবারে নারীর কদর বহুগুণে বেড়ে যায়। অপরদিকে সন্তানহারা নারী এবং মেয়ে সন্তানের মাকে পরিবার ও সমাজের বিভিন্ন মানুষের কটু কথা, অবহেলা ও অবজ্ঞাসহ বিভিন্নভাবে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়। এমনকি এসব কারণে তালাক ও হয়ে থাকে।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর নিজ শরীরও পুরুষের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হয়। সামাজিক মূল্যবোধ অনুযায়ী একজন পুরুষ বা স্বামী যখনই চাইবে তখনই তার ইচ্ছার কাছে স্ত্রীকে সমর্পণ করতে হবে। বিবাহিত নারী কোন্ সময়ে সন্তান গ্রহণ করবে, সন্তান নেবে সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় পরিবারের পুরুষ। এছাড়া পিতৃতন্ত্র সব সময় এটা বলতে চায় যে ধর্মীয়ভাবেই নারীকে পুরুষের অধীন করে দেয়া হয়েছে যা আদৌ সত্য নয়। এমনকি ধর্মীয় আইনে নারীকে যেসব অধিকার দেয়া হয়েছে সেগুলোর অধিকাংশই এই পুরুষ প্রধান তথা পিতৃতান্ত্রিক সমাজে প্রয়োগ করা যায় না। যেমন অনেক শিক্ষিত ও স্বচ্ছল পরিবারে এমন উদাহরণ রয়েছে যেখানে ভাই বা অন্য আত্মীয় স্বজনদের স্বার্থপরতার শিকার হয়ে উত্তরাধিকারীর ন্যায্য পাওনা থেকে নারীরা বঞ্চিত হয়েছে। সম্পত্তির ন্যায্য পাওনা বুঝে নিতে চাইলেই নারীকে আখ্যায়িত করা হয় সম্পত্তি লোভী হিসাবে।

এছাড়া ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের স্কুলে কম যাবার পার্থক্যটি নারী শিক্ষার প্রতি অভিভাবকদের নেতিবাচক মনোভাবকে তুলে ধরে। কারণ তারা মেয়েদের শিক্ষার বিষয়টিকে কম মূল্য দেয়। নারী তার অধিকাংশ কাজেরই কোন আর্থিক মূল্য পায় না। সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রেও নারীকে ক্রমাগতভাবে উপেক্ষা করা হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কৃষিকাজ এবং সংসারের কাজকে মজুরি শ্রম হিসাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে নারীর কাজের সময় পুরুষের চেয়ে ৩০ শতাংশ বেশী। কিন্তু নারীরা কদাচিৎ জমির মালিক হতে পারে। এছাড়া ঋণ এবং কৃষি সম্প্রসারণ সংক্রান্ত যাবতীয় সুযোগ সুবিধা আসে জমির মালিকদের নামে।

জেন্ডার বৈষম্য নারীর আত্মমর্যাদা ও সম্মান-সমতা ও কর্ম উদ্দীপনাকে নষ্ট করে দেয়। যেসব অভিজ্ঞতা নারীর যোগ্যতা গড়ে তোলে, তাকে দিকনির্দেশনা পেতে সাহায্য করে এবং পুরুষের সমান অংশীদার হতে সক্ষম করে তোলে তা থেকে বঞ্চিত হয় নারীরা এই জেন্ডার বৈষম্যর কারণে।

আমরা অনেকেই পুরুষের সহিংসতার শিকারদের নিয়ে কথা বলে থাকি কিন্তু যারা নির্যাতন করে তাদের অর্থাৎ পুরুষদের নিয়ে কথা বলি না। পুরুষ কেন এত বেশী নিষ্ঠুর হয় ? কেন এবং কিভাবে কিছু পুরুষ এত নিষ্ঠুর এবং অমানবিক হয়ে ওঠে যে সে একটি ছোট্ট মেয়েকে ধর্ষণ করতে পারে? এ ব্যাপারে আমরা কি কখনও একটু ভেবে দেখেছি? ছেলেরা তেজী বা নিষ্ঠুর হয়ে জন্ম নেয় না। আমরা ভদ্র সহানুভূতিশীল অনেক পুরুষের কথা জানি। আবার কিছু রাগী, কর্তৃত্বপরায়ণ পুরুষের চেহারাও আমাদের দেখা আছে যারা তাদের চাইতে উর্ধ্বতনের সামনে সব সময় কুণ্ঠিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ সব পুরুষ জন্মগত ভাবে আগ্রাসী, কর্তৃত্বপরায়ণ বা রাগী নয়। এই সমাজ এবং সমাজের মানুষ অর্থাৎ আমরা সবাই মিলেই একজন পুরুষের পুরুষ হয়ে ওঠা নির্ধারণ করি এবং ছেলে বা পুরুষদেরকে ঐ

নির্দিষ্ট ছাঁচে ফেলে দিই এবং ঐ নির্দিষ্ট ছাঁচে গড়ে উঠতে বাধ্য করি। ছেলেদেরকে দেখানো হয় দৃঢ়পত্যয়ী হতে। তাদেরকে এভাবে বোঝানো হয় তারা "সংসারের প্রদীপ" এবং তারা মেয়েদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। এর ফলে প্রায়ই দেখা যায় বেশীর ভাগ ছেলেরা আগ্রাসী, উচ্চ কণ্ঠ হয়ে ওঠে। আবার বাবা-মাও তাদের প্রশ্রয় দেয়। জেন্ডারের এই গতানুগতিক ধারণা মেয়েদের পাশাপাশি পুরুষদের গতিবিধি, পছন্দ-অপছন্দকে সীমাবদ্ধ করে দিচ্ছে। ছেলেদের শক্তির মুখোশ পরে থাকতে বাধ্য করা হয়। যেহেতু ভাবা হয় যে পুরুষের কান্না, দুর্বলতা, আবেগ- অনুভূতি প্রকাশ করা অনুচিত, তাই তারা নিজেদের দুর্বলতা, অসহায়ত্ব; আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করতে পারেনা। এটা প্রায়ই অস্বীকার করা হয় যে, একজন পুরুষও অন্য একজন পুরুষের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে । যেসব ছেলেরা নম্র, ভদ্র তারা সব সময় চাপের মুখে থাকে। সাধারণত আশা করা হয় যে পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করবে। যদি কোন পুরুষ বা স্বামী তার স্ত্রীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে, সেক্ষেত্রে তাকে "বউ পাগলা" বলে উপহাস করা হয়। যেসব পুরুষ আগ্রাসী বা বল প্রয়োগকারী নয় তাদেরকে 'হাতে চুরি পরতে' বলা হয় এবং নারীদের সঙ্গে তুলনা করে অপমান করা হয়। অন্যদিকে যেসব নারী কর্তৃত্বপূর্ণ বা ক্ষমতাবান অবস্থানে থাকে তাদেরকে প্রশংসা করে বলা হয় "এরা পুরুষের মতই ভালো" কিংবা "পুরুষের চেয়ে কম নয়"।

এভাবেই পরিবার, স্কুল, গণমাধ্যম, আইন, রাজনীতি নারী ও পুরুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, মনোভাব, আচার আচরণ, ভূমিকা, অধিকার এমনকি নারী পুরুষের আলাদা আলাদা আশা ও স্বপ্ন নির্মান করে।

পিতৃতান্ত্রিকতাকে চ্যালেঞ্জ করার আন্দোলনে পুরুষদেরও অংশ নিতে হবে। কেননা পিতৃতন্ত্র শুধু নারীদেরই ক্ষতি করছে না। সেই সঙ্গে পুরুষদেরও ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়াচ্ছে। তাদের কঠোর অমানবিক করে তুলছে। তাই জেন্ডার সম্পর্ককে আরও সমতাপূর্ণ ও ন্যায্য করে তুলতে এই পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবের পরিবর্তন আনতেই হবে।

\

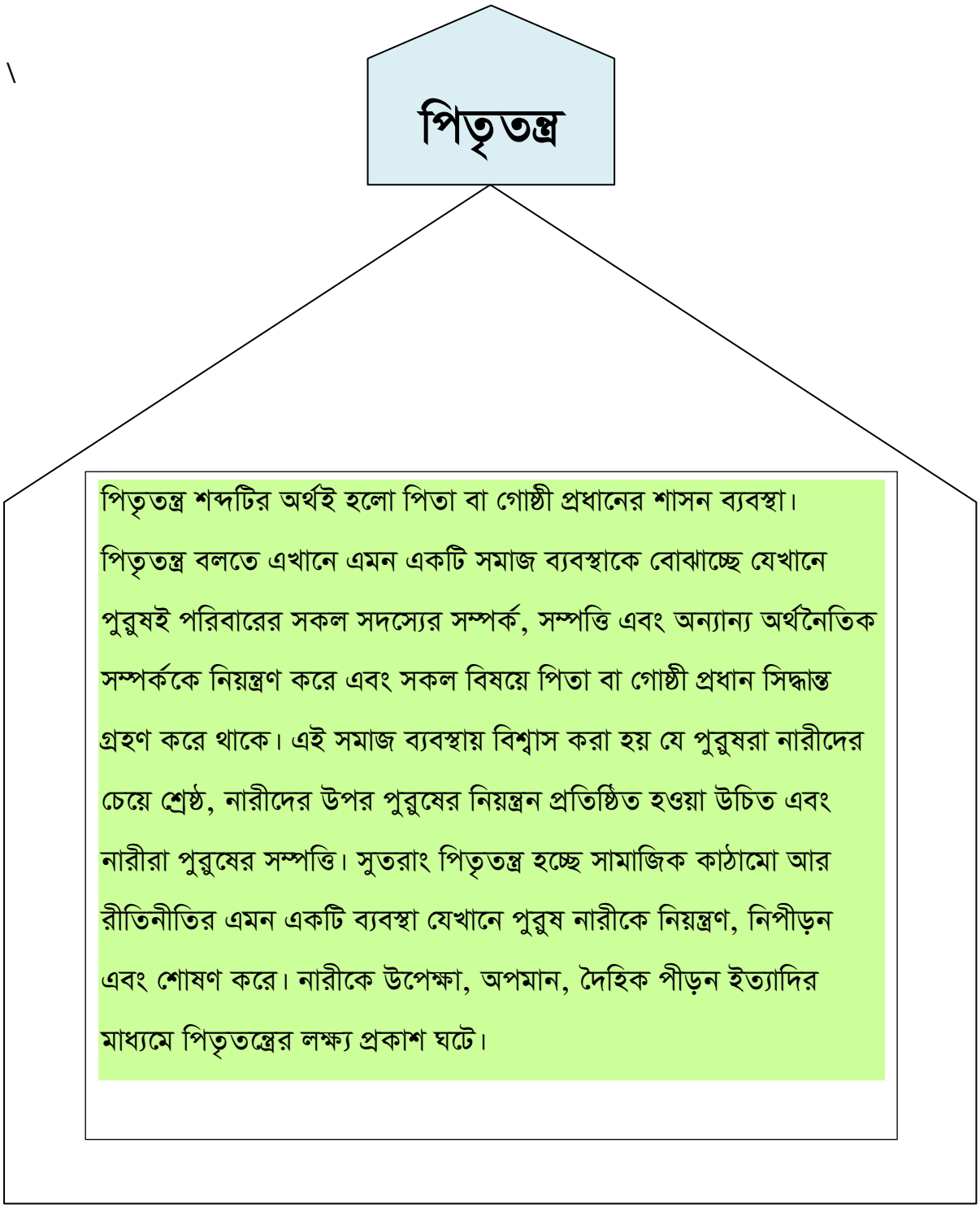
পিতৃতন্ত্র
পিতৃতন্ত্র শব্দটির অর্থই হলো পিতা বা গোষ্ঠী প্রধানের শাসন ব্যবস্থা। পিতৃতন্ত্র বলতে এখানে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থাকে বোঝাচ্ছে যেখানে পুরুষই পরিবারের সকল সদস্যের সম্পর্ক, সম্পত্তি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সকল বিষয়ে পিতা বা গোষ্ঠী প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। এই সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাস করা হয় যে পুরুষরা নারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, নারীদের উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং নারীরা পুরুষের সম্পত্তি। সুতরাং পিতৃতন্ত্র হচ্ছে সামাজিক কাঠামো আর রীতিনীতির এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে পুরুষ নারীকে নিয়ন্ত্রণ, নিপীড়ন এবং শোষণ করে। নারীকে উপেক্ষা, অপমান, দৈহিক পীড়ন ইত্যাদির মাধ্যমে পিতৃতন্ত্রের লক্ষ্য প্রকাশ ঘটে।

ইন্টারসেকশনালিটি

- **ধরা যাক, একজন দরিদ্র ব্যক্তি যার গায়ের বর্ণ সাদা এবং তিনি তৃতীয় লিঙ্গের অধিকারী। যদিও সাদা গায়ের বর্ণ সাধারণভাবে তার সুবিধাজনক পরিচয়, তবে তিনি তার অন্য দুই পরিচয়ের জন্য সমাজে বঞ্চনার শিকার হন।**
- **একজন কালো বর্ণের নারীর কথা ভাবা যাক, যিনি উচ্চ শিক্ষিত, তারুন্যে উদ্দীপিত, এবং যার কোনো শারীরিক প্রতিবন্ধিতা নেই। কালো এবং একজন নারী হবার কারণে তিনি অবহেলার শিকার হন, তবে উচ্চ শিক্ষিত, তরুন্নী ও শারীরিকভাবে অপ্রতিবন্ধী হবার কারণে তিনি কিছু সুবিধালাভ করেন।**

১৯৮৯ কিমবার্লি ক্রেনশ' 'ইন্টারসেকশনালিটি' শব্দটি ব্যবহার করেন। একজন নাগরিক অধিকার কর্মী ও বর্ণবাদ তত্ত্বের প্রভাবশালী সমালোচক হিসেবে এই শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন এটা বোঝানোর জন্য যে, জেন্ডার, বর্ণ (গায়ের রঙ), অর্থনৈতিক শ্রেণি এবং ইত্যাদি বহু পরিচয় একজন ব্যক্তির বঞ্চনার পেছনে বহুমাত্রিক ভূমিকা পালন করে।

নানান দিক থেকে সমাজে একই মানুষের বহু পরিচয় নির্ধারিত হয়; যেমন, জাতি পরিচয়, গায়ের রঙ, বংশ পরিচয়, জাতীয়তা, গোষ্ঠী পরিচয় (আদিবাসী পরিচয়), সেক্স (লৈঙ্গিক পরিচয়)/জেন্ডার, ভাষা, ধর্ম, রাজনীতি বা মতাদর্শগত পরিচয়, গোত্র পরিচয়, সম্পত্তির ভিত্তিতে, জন্মগত, প্রতিবন্ধিতা, বয়স, স্বাস্থ্যগত, যৌন আচরণ, সংস্কৃতিগত, পেশাগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি। এরকম এত ধরনের পরিচয় একই ব্যক্তির বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তৈরি হয় যে সেগুলোর পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কেননা, স্থান-কাল-প্রেক্ষাপট ভেদে ব্যক্তির নতুন নতুন পরিচয় প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা থাকে। এইসব বহুবিধ পরিচয় একই মানুষের মধ্যে সহাবস্থান করে। বহুমাত্রিক ও পরিবর্তনশীল পরিচয়ের ভিত্তিতে ব্যক্তির বিশেষ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার পদ্ধতিইহলো**ইন্টারসেকশনাল বিশেস্নষণ**।

ইন্টারসেকশনালিটি,

- বিভাজন করে না
- পরিস্থিতি বুঝতে সহায়তা করে
- সম্মান প্রদর্শন করতে উদ্বুদ্ধ করে
- সমবেদনা অনুভব করায়
- অধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে
- সকল ধরনের শোষণ-বঞ্চনা চিহ্নিত করে
- ইন্টারসেকশনালিটি মানুষকে নিজের উর্ধ্বে গিয়ে অন্য মানুষদের চাহিদা ও উদ্বেগের কথা শুনতে ও উপলব্ধি করতে সহায়তা করে।

ইন্টারসেকশনাল বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে বিশেষ সময়ে ও বিশেষ পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তির অবস্থা ও অবস্থান সেই ব্যক্তির একটি পরিচয়ের সাপেক্ষে নির্ধারণ করা যায় না। ইন্টারসেকশনালিটি ব্যক্তির পরিচয় নির্ধারণের সকল দিক বিবেচনা করার উপর জোর দেয়। এর ফলে, এটা আন্দাজ করা যায় যে বৈচিত্রপূর্ণ সমাজের সদস্য হিসেবে ব্যক্তি যে বহুরকম বৈষম্য ও শোষণের শিকার হয়। আধুনিক সমাজে ক্ষমতাবান ও সবিধাবাদী শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের মধ্যেই জন্ম নেয় অন্যায় ও অবিচার। ইন্টারসেকশনালিটি বিশ্লেষণ করে আমরা বুঝতে পারি যে ক্ষমতা-মানচিত্রের যে অবস্থানেই ব্যক্তি থাকুক না কেন, বিশেষ পরিস্থিতিতে অন্যান্যদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কারো কারো চেয়ে সে শ্রেষ্ঠতর, আবার একইসাথে, কারো কারো চেয়ে নিম্নতর। অধিকন্তু, সময় ও পরিস্থিতির সাপেক্ষে এই অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে।

নারী হিসেবে একজন ব্যক্তির বৈষম্য ও অন্যায়ের শিকার হওয়ার পরিস্থিতি ইন্টারসেকশনাল বিশ্লেষণ করলে উপলব্ধি করা যায় যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের আধিপত্যের কারণে একজন নারীর অবস্থা কি ও তার অবস্থান কোথায়;

কিন্তু একইসাথে এটাও বোঝা সম্ভব হবে যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যখন বৈষম্যের শিকার হয়, তখন নানা পরিচয়ের সমাহার হিসেবে একজন নারীর আক্রান্ত হওয়ার মাত্রা কতখানি। ইন্টারসেকশনাল বিচশ্লেষণের মাধ্যমে নারীর সমতা, মর্যাদা, ন্যায় বিচার অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার পথে এগিয়ে যেতে হলে ইন্টারসেকশনাল নারীর প্রতি বহুমাত্রিক বৈষম্য ও বিচারহীনতা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ চিহ্নিত করা সম্ভব।

যদি, পারিবারিক নির্যাতনের শিকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন নারীর ইনটারসেকশনাল বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে হয়তো দেখা যাবে যে, তিনি কেবল নারী হিসেবেই নানান অবিচার ও বৈষম্যে আক্রান্ত; উপরন্তু তিনি গরিব, আবার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য। তার লৈঙ্গিক, জাতিগত ও আর্থ-সামাজিক পরিচয়ের কারণে তাকে ভিন্নমাত্রার বৈষম্য ও অন্যায়ের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। তার স্বামী যখন তাকে শারীরিক নির্যাতন করছেন, তখন তার জাতিগত পরিচয় বা আর্থ-সামাজিক পরিচয় বিবেচ্য নয়। তখন তিনি একজন নারী এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে স্ত্রীর গায়ে হাত তোলার অধিকার পুরুষের আছে। কিন্তু পরমূহুর্তে যখন তিনি আহত শরীর নিয়ে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে যাচ্ছেন, তখন তাকে বুঝতে হচ্ছে যে তিনি গরিব এবং তার অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ধারণ করছে যে চিকিৎসাসেবায় তার প্রবেশাধিকার ধনীদের সমকক্ষ নয়। আবার স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রের কোটা সুবিধা নিতে তাকে তার জাতিগত পরিচয় সংক্রান্ত প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এই নারী যদি গর্ভবতী হয়ে থাকেন, কিংবা প্রতিবন্ধী, অথবা অল্প বয়সী বা বেশি বয়স্ক তাহলে তার বঞ্চনাগুলো আরো নানা মাত্রা পায়। ইন্টারসেকশনাল বিশ্লেষণ আমাদের ব্যক্তি হিসেবে নারীর এই জটিল পরিচয় উপলব্ধি করতে সহায়তা করে।

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে নারীর 'নির্যাতিত' পরিচয়ের বাইরে আরো পরিচয় প্রকাশিত হতে পারে। দখলদার বা অধিকতর ক্ষমতাশালী পক্ষের পুরুষেরা দুর্বল পক্ষের নারীদের সাথে হিংস্র আচরণ করে। এই নারীরাই আবার নিজেদের সমাজের পুরুষদের, যারা কি না বউ পেটায় বা নারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব খাটায় - সেই পুরুষদের, রক্ষা করার জন্য প্রাণপণ করে; পুরুষদের তারা পালিয়ে যেতে সাহায্য করে, লুকিয়ে রাখে ইত্যাদি।

ইন্টারসেকশনাল বিশ্লেষণ নারীর প্রতি অবিচারের বহুমাত্রিক স্বরূপ উপলব্ধি করতে সহায়তা করে এবং চিহ্নিত ইস্যু মোকাবেলায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়ক হয়।

সংক্ষেপে নিম্নরূপে ইন্টারসেকশনালিটি ব্যাখ্যা করা যায়

- একই ব্যক্তির মধ্যে বহু পরিচয়ের সম্মিলন;
- কোনো বিশেষ অবস্থায় ব্যক্তির উপর তার বহু পরিচয় যে প্রভাব তৈরি করে;
- ব্যক্তির নানা পরিচয়ের বহুমাত্রিক প্রভাবের ফলে ব্যক্তি যে তৃতীয়/অন্য পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়;
- ব্যক্তির ইতিবাচক পরিচয়ের সাথে তার নেতিবাচক পরিস্থিতির কারণের ইন্টারসেকশন হতে পারে;
- ব্যক্তির অবদমনের দুটি কারণের মধ্যেও ইন্টারসেকশন হতে পারে;
- ব্যক্তির কোনো নির্দিষ্ট পরিচয় এক পরিস্থিতিতে তার জন্য ইতিবাচক হতে পারে, কিন্তু একই পরিচয় অন্য পরিস্থিতিতে হতে পারে নেতিবাচক

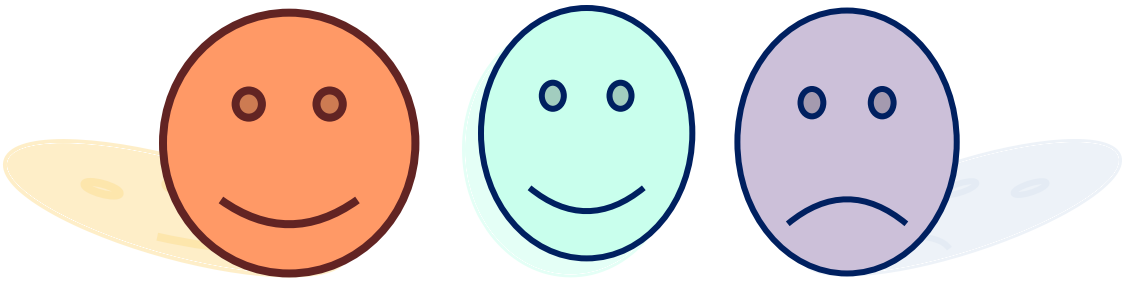

সুবিধাজনক পরিচয়		অবদমিত পরিচয়
পুরুষ ও পুরুষালী স্বভাব/ নারী ও মেয়েলী স্বভাব	জেন্ডারবাদ	- জেন্ডার "ডেভিয়্যান্ট"/ জেন্ডারবাদ বিরোধী
পুরুষ –	পৌরুষবাদ	- নারী
সাদা –	বর্ণবাদ	- নানা রঙের (গাত্রবর্ণের) মানুষ
বিপরিত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষন –	স্বাভাবিকতাবাদ	- সমকামী (লেসবিয়ান/ গে), উভকামী
সবলকায়/বলিষ্ঠ –	সবলতাবাদ	- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি
প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উচ্চ শিড়িাত	সুশীলীয়বাদ	- নিরড়ার, প্রাতিষ্ঠানিক শিড়া বঞ্চিত
তরুণ –	বয়সিবাদ	- বয়স্ক ব্যক্তি
আকর্ষণীয় –	দর্শনদারিবাদ	- অনাকর্ষণীয়
জন্মসূত্রে ইউরোপিয়ান –	ইউরোসেনট্রিজম (ইউরোপিয়ান অহংবোধ)	- অ-ইউরোপিয়ান
উচ্চবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত	শ্রেণি পড়াপাতিতাবাদ	- শ্রমজীবী শ্রেণী, দরিদ্র
ইংরেজিপ্রীতি –	ভাষা পড়াপাতিতাবাদ	- ইংরেজিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গণ্য করা
ফ্যাকাসে, হালকা গাত্রবর্ণ	বর্ণবাদ	- কালো (গাত্রবর্ণ)
ধর্মীয় সংখ্যাগুরুন –	আধিপত্যবাদ	- ধর্মীয় সংখ্যালঘু
জন্মদানে সড়াম –	সড়ামতাবাদ	- সন্তান জন্মদান/ গর্ভধারণে অড়াম

ইন্টারসেকশনালিটি চার্ট